বরাকের চা জনজাতি কেন্দ্রিক লোকসাহিত্যে জনজীবন ও সংস্কৃতি : একটি উপনিবেশোত্তরবাদী অধ্যয়ন

আসাম বিশ্ববিদ্যালয়, শিলচর, বাংলা বিভাগে পিএইচ.ডি. উপাধির জন্য প্রদত্ত গবেষণা সন্দর্ভের সংক্ষিপ্তসার

গবেষক

সুব্রতা মজুমদার

পঞ্জিয়ন ক্রম ঃ পিএইচ.ডি/২২০০/১৩

তারিখ ঃ ০৫.০৪.২০১৩

বাংলা বিভাগ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ভারতীয় ভাষা ও সংস্কৃতিচর্চা অধ্যয়ন অনুষদ

আসাম বিশ্ববিদ্যালয়, শিলচর

আসাম, ভারত

২০১৬

অধ্যায় বিভাজন

		পৃষ্ঠা
ভূমিকা		১-৩
প্রথম অধ্যায়	উপনিবেশোত্তরবাদের সংজ্ঞা ও স্বরূপ উপনিবেশোত্তর চেতনার বৈশিস্ট্য উপনিবেশোত্তর সাহিত্যে শ্রেণিবিভাজনের বাস্তব সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক প্রসঙ্গ	৪-৭
দ্বিতীয় অধ্যায়	বরাকের চা জনজাতিতে শৈক্ষিক পরিবেশ ও ভাবনা	৭-১০
তৃতীয় অধ্যায়	বরাক উপত্যকায় বাগান কেন্দ্রিক জনজীবনে অর্থনৈতিক নিপীড়ন ও প্রতাপের ভূমিকা	১১-১৪
চতুর্থ অধ্যায়	সমকালীন পণ্য সংস্কৃতি বনাম বরাকের চা বাগিচার জনগোষ্ঠী ও জনজীবন	১৫-১৭
পঞ্চম অধ্যায়	বরাকের চা জনজাতির লোকসাহিত্যে জনজীবন ও সংস্কৃতি	১৮-১৯
ষষ্ঠ অধ্যায়	বরাকের চা জনগোষ্ঠী এবং ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা ও ত্রিপুরা অঞ্চলের চা বাগানের জনসমাজ	২০-২২
উপসংহার		২৩-২৪

ভূমিকা

মূলত 'বরাক উপত্যকা' বাঙালি, মণিপুরি, হিন্দুস্থানি, চা জনজাতি, কাছাড়ি, মার, রংমাই নাগা দের বাসভূমি । বরাক নদী সহ কুশিয়ারা, সুরমা, জিরি, চিরি, মধুরা, জাটিঙ্গা,কাটাখাল, ধলাই, লঙ্গাই প্রভৃতি স্রোতস্বিনী বয়ে নিয়ে চলেছে বরাক উপত্যকার সংস্কৃতির ভাণ্ডার । রয়েছে বাঙালি, মণিপুরি, ডিমাসা, চা জনজাতির সংস্কৃতির বিপুল সম্পদ । বাউল, মুর্শিদী, ভাটিয়ালি, জারি- সারি, লোকগীতি- ধামাইল, ওঝা- গাজী, চড়ক নৃত্যের সংমিশ্রণে রয়েছে বাঙালি সংস্কৃতি । রয়েছে বিশিষ্ট ধরণের বাঁশি ও ঢাক সহযোগে করে থাকা ডিমাসা লোকগীতি ও লোকনৃত্য । রয়েছে সুন্দর পোষাকে মন কেড়ে নেওয়া লাইথরাওবা, খাম্বাথৈবী, রাসনৃত্যে ভরপুর মণিপুরি সংস্কৃতি । আর রয়েছে বাঁশির সুরে, মাদলের তালে, ঝুমুর গানে মন মাতিয়ে তোলা চা জনজাতি সংস্কৃতি। এ যেন বিচিত্র সংস্কৃতিধারার এক মিলনভূমি ।মহাভারতের সাগরতীরে দাঁড়িয়ে রবীন্দ্রনাথ যে বাণী উচ্চারণ করেছিলেন বরাক উপত্যকা তার- ই প্রতিধ্বনি তুলে বলতে পারে –

"রণধারা বাহি জয়গান গাহি উন্মাদ কলরবে
ভেদি মরুপথ গিরিপর্বত যারা এসেছিল সবে ।"

- ভারততীর্থ, রবীন্দ্রনাথ

সুদূর প্রাচীনকাল থেকে অষ্ট্রিক গোষ্ঠীর খাসি, সিন্টেং মাঙ্গোলয়েড গোষ্ঠীর গারো, বড়ো, কোচ, রাভা, কাছাড়ি, টিপরা, কুকি, আর্য ব্রাহ্মণ এবং চা

বাগানের পত্তনের পর অষ্ট্রিক ও দ্রাবিড় গোষ্ঠীর সাঁওতাল, মুন্ডা ইত্যাদি জনগোষ্ঠী বরাক উপত্যকায় আসে । বিভিন্ন সময়ে তাই বিভিন্ন জাতি এসে বরাকে বসতি স্থাপন করে কবিগুরুর বলা 'ভারততীর্থ' র মতো এ অঞ্চলকে 'বরাকতীর্থে' পরিণত করেছে ।

এই বরাক উপত্যকাকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছিল ১৯৬১- ১৯শে মে- র ভাষা আন্দোলন । শিলচর রেল ষ্টেশনে অনেক লোককে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। অবিভক্ত সুরমা বরাকের প্রধান নেতাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য যাঁরা, এঁরা হচ্ছেন -- বসন্ত কুমার দাস, আব্দুল মতিন, কামিনী কুমার চন্দ, অরুণ চন্দ প্রমুখ। ১৯২১ সালে এখানকার চা শ্রমিকরা মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনের ডাকে সাড়া দিয়ে বেরিয়ে যায় যা বরাক উপত্যকার ইতিহাসে 'চরগোলা এক্সোডাস' নামে খ্যাত। বরাক উপত্যকার অর্থনৈতিক অবস্থা মোটামুটি ভালো। চা, ধান, কাঠ, বাঁশ, বেত, পাথর, প্রাকৃতিক ইন্দন এখানকার মূল উৎপন্ন দ্রব্য । প্রামাণ্য ঘাটতে গিয়ে দেখা যায় (বর্তমান বরাক উপত্যকা) তৎকালীন কাছাড়ের জেলাশাসক এক প্রতিবেদনে বলেন যে স্থানীয় জঙ্গলে চা এর সন্ধান পাওয়া গেছে। সাল ১৮৫৫ ইং:। এবং পরের বছরেই বরসাঙ্গন চা বাগানে (বর্তমান বজরংপুর) প্রথম চা বাগান স্থাপিত হয়। এর প্রতিষ্ঠা করেন মেসার্স উইলিয়ামসন এন্ড কোম্পানি। একেবারে গোড়ার দিকে স্থানীয় মজুর, বিশেষত নাগা, লুসাই, ডিমাসা প্রভৃতি সম্প্রদায়ের লোকেরা বাগানে শ্রমিকের কাজে নিযুক্ত করা হয় । কিন্তু সেইসব মজুররা একসময় যখন তাদের অসুবিধের জন্যই হোক আর চা করেরাই তাদের বাগানের কাজের অনুপযুক্ত ভেবেই হোক তারা আর কাজে গেল না। প্রয়োজন হয় তখন শ্রমিকের, চা

করেরা তখন দেশের বিভিন্ন জায়গায় আড়কাঠি নিয়োগ করলেন শ্রমিক সংগ্রহের জন্য । এই আড়কাঠিরা, বিশেষভাবে তখন দুর্ভিক্ষ কবলিত যে জায়গাগুলো ছিল যেমন উত্তর প্রদেশ, বিহার, পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া, মেদনীপুর, ছোটনাগপুর, পুরুলিয়া, বর্ধমান, ওড়িশা, মাদ্রাজ, ঝাড়খণ্ড ও অন্ধ্রপ্রদেশ প্রভৃতি অঞ্চল থেকে নানা প্রলোভন দেখিয়ে দলে দলে পুরুষ মহিলা ও শিশুদের বরাক উপত্যকার চা বাগান গুলোতে নিয়ে এল এবং চুক্তির ভিত্তিতে তাদের কাজে নিয়োগ করা হল । কাজ করতে করতে একসময় দেখা গেল যে চুক্তি শেষ হয়ে যাওয়ার পরও ঘর বাড়ি করে এখানেই স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে থেকে গেল, অনেকটাই হয়তো বাধ্য হয়েই করতে হয়েছে তাদেরকে এমনটা । আজও আধুনিক সমাজ ব্যবস্থার আলো থেকে তারা অনেকটাই দূরবর্তী বলে তাদের প্রকৃত অবস্থান আমাদের অনেকেরই কাছে অধরা ও অস্পষ্ট থেকে গেছে । আমরা আশায় বাঁধি ঘর । চা জনজাতিদের প্রতিদিনের বেঁচে থাকার লড়াই দেখে আমাদের মনেহয় তারাও একদিন বেরিয়ে আসবে অন্ধকার থেকে একজাতি একপ্রাণ হয়ে ।

প্রথম অধ্যায়

উপনিবেশোত্তর বাদের সংজ্ঞা ও স্বরূপ --উপনিবেশোত্তর চেতনার বৈশিষ্ট্য উপনিবেশোত্তর সাহিত্যে শ্রেণিবিভাজনের বাস্তব সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক প্রসঙ্গ

উপনিবেশের পতন আর উপনিবেশোত্তর চেতনার বিকাশ এক নয় । চিন্তার ক্ষেত্রে বৈকল্য ও বিশৃঙ্খলা ব্যাপক । প্রান্তবাসী জনগোষ্ঠীকে বৃত্তের পরিধির মধ্যেই জীবনকে সীমাবদ্ধ না রেখে, পুঁজিবাদীদের শাসনের গ্যাঁড়াকল থেকে বেরিয়ে আসার পথ নিজেকেই খুঁজে বের করতে হবে । ব্রিটিশরা এদেশে তাদের উপনিবেশ স্থাপন করেছিল । এবং তাদের সবকিছু আমাদের উপর চাপিয়ে দিয়েছিল । একসময় সেই উপনিবেশের স্থপতিরা যখন চলে গেল, তখন আমাদের চেতনার স্বরূপটা অন্যদিকে মোড় নীল । ব্রিটিশরা চলে গেলে আমরা আন্দোলন করতে শিখলাম, আমরা ঠিক করলাম যে আমরা নিজেদের ভাগ্য নিজেরাই গড়ব; কিন্তু এই প্রত্যাশা ও প্রতিশ্রুতি সমানমানে চলেনি । আমরা অন্য উপনিবেশিকতার কবলে পড়ে গেলাম; সেটা হল ধনতন্ত্র, ক্ষমতাশালী বা ধনিক সমাজ । দেশের অবস্থানের পরিবর্তন তেমন করে কিছু হয় নি । কলোনিয়াল প্রভুরা চলে গেলে দেখা গেল এ দেশেরই ধনিক সমাজ (টাটা, বিরলা, বাজাজ প্রমুখ) প্রভুরা বেরিয়ে এল ঠিকই; কিন্তু শোষিতদের আর্থসামাজিক অবস্থার কোন কিছুরই কোন উন্নতি ঘটেনি । শোষিত শ্রেণি নিজেদের অধিকারের লড়াই আগে বোঝে নি কারণ তখন প্রভুরা ছিল বিদেশি, উপনিবেশোত্তর চেতনায় শোষিত বর্গরা লড়াই করতে শিখলেও কোনো

পরিবর্তন হয়নি, এখন দেশীয় প্রভুদের দাসত্বের কবলে শোষিত শ্রেণির শোষণ একইরকম থেকে গেছে।

উপনিবেশোত্তর চতনার বৈশিষ্ট

উপনিবেশোত্তর চেতনা ধীরে কিন্তু নিশ্চিতভাবে সমস্ত দৃশ্য-অদৃশ্য শেকল ভেঙে ফেলছে, তারই প্রতিবেদন সামাজিক ও নান্দনিক ইতিহাস গড়ে উঠেছে অহরহ। অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধির প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক বিশ্বাস ও প্রকরণকে অস্বীকার করে এবং প্রত্যাহ্বান জানিয়ে সমস্ত ধরণের পূর্বধার্য বর্গাতয়নকে চূর্ণ না করা পর্যন্ত কোনো বিকল্প মূল্যবোধের জন্ম হতে পারে না -- এই হল উপনিবেশোত্তর চেতনার মৌল বক্তব্য। এর কতকগুলো বৈশিষ্ট্য এখানে উল্লেখ করা যায় এভাবে

(ক) উপনিবেশোত্তর চেতনা সর্বপ্রথম দায়িত্ব হিসেবে মুখোশ থেকে মুখকে এবং সত্যভ্রম থেকে সত্যকে আলাদাভাবে চিনিয়ে দেওয়ার প্রক্রিয়াকে প্রাধান্য দেয়।

(খ) উপনিবেশোত্তর মূল্যবোধ স্বভাবে প্রতিবাদী এবং বিনির্মাণপন্থী।

উপনিবেশোত্তর সাহিত্যে শ্রেণিবিভাজনের বাস্তব

উপনিবেশোত্তর চেতনা-সম্পৃক্ত কয়েকটি রচনার নাম হল, হাসান আজিজুল হকের 'আত্মজা ও একটি করবী গাছ' ও 'পাতালে-হাসপাতালে' ও 'খোয়াবনামা', সেলিনা হোসেনের 'নীল ময়ূরীর যৌবন' ও 'গায়ত্রীসন্ধ্যা', দেবেশ রায়ের 'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত', মলয় রায় চৌধুরির 'ডুবজলে যেটুকু প্রশ্বাস', সুবিমল মিশ্রের 'আসলে এটি রামায়ণ চামারের গল্প হয়ে উঠতে পারত' ও

‘হারণ মাঝির বৌ এর মড়া বা সোনার গান্ধীমূর্তি’ অভিজিৎ সেন এর ‘দেবাংশী’ ও ‘রহুণ্ডালের হাড়’, সাধন চট্টোপাধ্যায়ের ‘গহীন গাঙ, ও মাটির অ্যান্টেনা’, ভগীরথ মিশ্রের ‘চারণভূমি’ ও ‘জ্ঞানগুরু’, স্বপ্নময় চক্রবর্তীর ‘অষ্ঠচরণ ষোল হাঁটু’ ও ‘চতুষ্পাঠী’ সৈকত রক্ষিতের ‘আকরিক’ ও ‘উঠোরে পুতা জাগরে পুতা’ অমর মিত্রের ‘দানপাত্র’ ও ‘অশ্বচরিতা’, জয়া মিত্রের ‘হন্যমান’ অনিল ঘড়াইয়ের ‘পরীযান’ ও ‘নুনবাড়ি’, নবারুণ ভট্টাচার্যের ‘হারবার্ট’ ও ‘যুদ্ধপরিস্থিতি’। উপরিউক্ত রচনাগুলির মধ্যে পারস্পরিক ভিন্নতা সত্ত্বেও একটা ঐক্যসূত্র খুঁজে পাওয়া যায়, বিষয়গুলোকে একটু বিশ্লেষণ করলেই দেখা যাবে যে ঔপনিবেশিক নির্মিতি এঁরা নিজের মতো করে সবাই প্রত্যাখান করেছেন। এবং আলাদা আলাদাভাবে প্রান্তিকায়িত সত্যকে নানা প্রকরণে আখ্যানের বিবিধ বিন্যাসে পুনরাবিষ্কার করেছেন।

কিংবা উত্তরপূর্বে যাঁরা লিখছেন, লেখা যাঁদের কাছে মূলত এক যুদ্ধ। যাদের ছোটগল্প সংস্করণগুলির শিকড় আসলে ঔপনিবেশিক আগ্রাসনের বিরোধিতায় শুরু হয়ে উপনিবেশোত্তর চেতনায় প্রোথিত হয়ে যায়। দেবীপ্রসাদ সিংহের ‘রূপকথার প্রত্যাবর্তন’ (১৯৯৭), অনুপ ভট্টাচার্যের ‘পাখি ও পালক’ (১৯৯৭), শ্যামল ভট্টাচার্যের ‘জামিছলঙ’ (১৯৯৯), কিশোররঞ্জন দে’র ‘উৎসে আরোগ্য আছে’ (১৯৯৯), দেবব্রত দেবের ‘অন্য কেউ’ (২০০০), রণবীর পুরকায়স্থের ‘বোকা কাশীরাম কথা’ (২০০১), শেখর দাশের ‘কোষাগার’ (২০০২), মিথিলেশ ভট্টাচার্যের ‘কক্ষপথ’ (২০০৪), এইসব সাহিত্য শ্রমিকরা এত প্রতিকূলতার মধ্যেও তাঁদের সাহিত্য অধ্যবসায় অটুট রেখে চলেছেন।

সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক প্রসঙ্গ

কলোনিয়াল প্রভুরা আমাদের দেশে আসে সামন্তদের হাত ধরে । ওরা বাইরে থেকে এসেছে বলে সামন্ত জমিদারদেরকে বলে ব্যবসায়িক মনোভাবনার কাজ করেছিল প্রথমত । এই সমস্ত রাজারা তখন সামাজিক অবস্থানটাকে একেবারে নীচে নিয়ে চলে যায়, নারীত্বের অপমান, শোষণ চলতে থাকে । নারীত্বের অপমান চূড়ান্ত আকার নেয় । সতীদাহ বাল্যবিবাহ বহুবিবাহ পণপ্রথা এই সমস্ত জিনিষগুলো ধীরে ধীরে একটা ব্যাধির আকার ধারণ করে । আর এসব অস্থিরতার সময়ে ইংরেজ প্রভুরা নিজেদের ঘর নিজেদের মত গড়ে নিয়েছে ।

সংস্কৃতি সবার জন্য হয় না বরং সংস্কৃতি যখন সবার নির্মিতি হয় তখনই তা সবার হয়ে ওঠে । যারা বিশ্লেষণ করে দেখতে চান না সংস্কৃতিকে, তাদের কাছে যুগযুগ ধরে সংস্কৃতির নির্যাস মোটামুটি অপরিবর্তনীয় থাকে ।

দ্বিতীয় অধ্যায়

বরাকের চা জনজাতিতে শৈক্ষিক পরিবেশ ও ভাবনা

যে চা বাগান গুলোতে শিক্ষা কতটুকু হচ্ছে এর পরিবেশ বা কিরকম? শিক্ষা ব্যক্তির পূর্ণতার বিকাশ ঘটায়, সেই পূর্ণতার বিকাশ চা বাগানে হচ্ছে কি? শিক্ষার উদ্দেশ্য যদি হয়ে থাকে নিরক্ষরতার অবসান ঘটানো, তাহলে বাগান অঞ্চল গুলোতে কি এর অবসান হয়েছে? সরকার যেখানে বলেছে নূনতম শিক্ষা মানে নিজের নাম ঠিকানা লিখা শিখতে হবে সমাজের প্রত্যেক স্তরের মানুষের, চা জনজাতিরা কি তাহলে সবাই শিখতে পারছে নিজের নাম ঠিকানা লিখা ? শিক্ষার উদ্দেশ্য বলতে এটাও বলা হয়ে থাকে যে সমাজের প্রতিস্তরের মানুষকে নিজ নিজ মেধা ও প্রবণতা অনুসারে বিকশিত হওয়ার সুযোগ দেওয়া; চা জনজাতিরা কি তাহলে পাচ্ছে সেই সুযোগ-সুবিধে নিজেকে শিক্ষিত করে বিকশিত করার? নাকি প্রত্যেকদিনই তাদের লড়াই করে যেতে হচ্ছে প্রকৃতির সঙ্গে, নিজের সঙ্গে, মুখোশধারি ঔপনিবেশিক শাসকদের সঙ্গে। কথাগুলো একটু ভেবে দেখা দরকার ।

শিক্ষার উদ্দেশ্য যেখানে সমগ্র দেশের নিরক্ষরতা দূর করা বাগান অঞ্চল সেখানে খুব বেশি পিছিয়ে । রাষ্ট্রীয় সর্বশিক্ষা অভিযানের দরুন প্রত্যেক চা বাগান এলাকায় স্কুল বা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খোলা হচ্ছে ঠিকই, ড্রেস-খাবার ইত্যাদিও দেওয়া হচ্ছে, কিন্তু এর কোনোটাই আসলে পুরোপুরি ভাবে অন্তেবাসি

জনজাতিদের কাছে গিয়ে পৌঁছোয় না। সেটা বরাকের যে কোনো অঞ্চলই হোক অবস্থান প্রায় একই।

চা জনজাতিদের মধ্যে যাদের আর্থিক অবস্থা একটু ভালো তারা ইংরাজি মাধ্যমের বিদ্যালয়গুলো থেকে নিজেদের সরিয়ে রাখতে পারে নি, পাঠাচ্ছে ছেলে মেয়েদের বাংলা-ইংরাজি মাধ্যম শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে। কিন্তু যারা আর্থিক দিক দিয়ে ততটা স্বচ্ছল নয় তারা ইংরাজি মাধ্যমের বিদ্যালয়গুলোর কথা ভাবতেই পারে না এত খরচা অধিক। আর চা বাগানের এলাকার ভেতরে কোনো ইংরাজি মাধ্যমের বিদ্যালয় নেইও এর জন্য চার থকে ছয় কিলোমিটার যেতে হয়। কিন্তু সরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যেখানে ড্রেস, বই, খাতা, খাওয়া সব দেওয়া হচ্ছে তারপরও তারা শিক্ষার আলো থেকে দূরে, বাচ্চাদের পাঠায় না বিদ্যালয়ে। তার পেছনেও কারণ রয়েছে যে কেন পাঠায় না বিদ্যালয়ে। কারণ হল চা শ্রমিকরা তাদের শিশু একটু বড় হলেই ভাবে কি করে সেই শিশু বাইরে থেকে দুপয়সা এনে পরিবার চালাতে সাহায্য করবে। আর্থিক সমস্যার জন্যই আসলে তারা এরকম করতে বাধ্য হয়। সরকারি খাবার গুলোও তাদের কাছে পুরোপুরি ভাবে পৌঁছোয় না। কোথাও যদি ভালো বিস্কুট, দুধ, ফল-মূল দেওয়া হয় সরকার থেকে, তা তাদের না দিয়ে শুধু এ্যারারুট বিস্কুট আর চকলেট দিয়েই সান্তনা দেওয়া হয়। এরকম অনেক জায়গা রয়েছে। এসবের বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলবে কে বা কারা ? সেসব শ্রমিক যারা সারাদিন খেঁটে বিকেলে ঘরে এসে সস্তায় মদ খেয়ে বউ-বাচ্চাদের পিটিয়েই চলে যায় তাদের দিন। এরপর শিশুরা একটু বড় হলেই তাদের লাগিয়ে দেওয়া হলো কাজে, হয় ফ্যাক্টরীতে নয় জঙ্গল থেকে জ্বালানি কাঠ আনতে তাদের পাঠিয়ে দেওয়া হয়। সুতরাং স্কুলে

গিয়ে পড়ার সময়ই নেই এদের । কথায় বলে ‘চ্যারেটি বিগিন্স এট হোম’ কিন্তু চা জনজাতিদের মধ্যে এটা কই! শহরে একটা শিশুর শিক্ষার জন্য তার বাবা-মা যেভাবে সচেতন থাকে বাগান অঞ্চল গুলোতে ঠিক এর বিপরীত । ফলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর পরিবেশ ও ঠিকঠাক গড়ে উঠতে পারছে না।

একমাত্র শিক্ষার আলো থেকে দূরে থাকার ফলে আজও তারা লাঞ্ছিত, বঞ্চিত, এবং শোষিত ।

তৃতীয় অধ্যায়

বরাক উপত্যকায় বাগান কেন্দ্রিক জনজীবনে অর্থনৈতিক নিপীড়ন ও প্রতাপের ভূমিকা

বিখ্যাত একটা কথা আছে 'খাওয়ার জন্য বেঁচে থাকতে নেই, বেঁচে থাকার জন্য খাওয়া'। ঐ বেঁচে থাকার জন্যই যেটুকু খাওয়ার প্রয়োজন তা কি বরাক উপত্যকার চা জনজাতিদের কপালে জোটে ? উত্তর সম্ভবত না- ই হবে। অনাহারে চা বাগানে শ্রমিক মারা যাবার খবর সর্বত্রই চোখে পড়ে। উত্তর খুঁজতে গিয়ে প্রয়োজন হয়ে পড়ে উপনিবেশোত্তর অধ্যয়ণ। উপনিবেশোত্তর অধ্যয়ণই আমাদের সাহায্য করে আজকের বিশ্বায়নের যুগে দাঁড়িয়ে বরাক উপত্যকার বাগান কেন্দ্রিক জনজীবনে অর্থনৈতিক নিপীড়ন ও প্রতাপের ভূমিকা কিরকম সেটা বুঝে নিতে। ঔপনিবেশিক শাসকরা একসময় তাদের তলপি তলপা গুটিয়ে এদেশ থেকে বিদায় নিলেও শাসনের কোনো অবসান আজও হয়নি বলেই মনে হয়, অন্তত বরাক উপত্যকার চা বাগানগুলোতে চোখ বুলোলেই তা সহজে চোখের সামনে ভেসে ওঠে।

যারা সকালে ঘুম থেকে ওঠে আমেজ করে বসে খবরের কাগজ হাতে নিয়ে অথবা অনলাইনে খবর পড়তে পড়তে চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বলে আহ...। যেখানে সেই চায়ের কাপে এক কাপ চা তৈরি করে পৌঁছে দিচ্ছে যারা তারা কি নিজের কষ্টের বানানো চা খেতে পারছে এরকম আমেজ করে, বলতে পারছে কি চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে আহ...? নিশ্চয়ই না। কারণ তারা তো

কাপে চা খায় না গ্লাসে বা 'তসলা'য় (হাড়ি) খায়। সূর্য ওঠে সূর্য ডোবে প্রতিদিন নতুন সকাল হয় কিন্তু বরাক উপত্যকার চা জনজাতির জীবনে কোনো নতুন সকাল আসে না । সকাল শুরু হয় দুটি রুটি, আলু চোখা (সেদ্ধ আলু) এক তস্‌লা (হাড়ি) নুন চা দিয়ে, সারাদিন খাটার পর রাত হয় একগ্লাস সস্তার মদ খেয়ে ঘুমিয়ে । শাসকবর্গের উদ্দেশ্য একটাই কি করে শ্রমিকদের কাছ থেকে সস্তায় শ্রম পাওয়া যায় । কোন চা বাগানের কথা বলব, কাছাড়ের দেওয়ান চা বাগান, বরথল চা বাগান, লালং চা বাগান, লাবক চা বাগান, দিলখুশ চা বাগান প্রভৃতি, হাইলাকান্দির লালামুখ চা বাগান, কালাছড়া চা বাগান প্রভৃতি না করিমগঞ্জের সিপেনজুরি চা বাগান, লালখিরা চা বাগান, আদমটিলা চা বাগান, কোনটা ? সব কটারইতো অবস্থান প্রায় একই।

চা বাগানের শ্রমিকদের দৈনিক মজুরি হচ্ছে ৭৫ টাকা । কাজের সময় হচ্ছে ৮ ঘণ্টা । আজকের বিশ্বায়নের যুগে দাঁড়িয়ে দৈনিক ব্যবহৃত জিনিষের মূল্য যেরকম আকাশ ছোঁয়া সেখানে এই সব জনজাতিদের অবস্থান কিরকম হতে পারে তা আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় । এই দৈনিক মজুরি ৭৫ টাকার উপরই নির্ভর করে শ্রমিকদের ' provident fund' (প্রভিডেন্ট ফান্ড), বোনাস, গ্রাচুইটির টাকা নির্ধারণ হয় । ফলে কম মজুরি হওয়ার ফলেই এসব ন্যায্য পাওয়া থেকে ও তারা বঞ্চিত হন । চা শ্রমিকরা যারা গ্র্যাচুইটি পান তারা যে খুব অনায়াসেই সেটা পেয়ে যান তা নয়, এখানেও বিস্তর অসঙ্গতি দেখা যায় । কাজ করতে করতে বা অবসর গ্রহণের পরই কোনও শ্রমিক মারা গেলে এর উপযুক্ত উত্তরসূরি বা দাবিদার নেই বলে অজুহাত বানিয়ে নেওয়া হয় । বোনাসের সময় দেখা যায় শ্রমিকের কাজের নিরিখে ৮ শতাংশ বা ৯ শতাংশ যেরকম হয় (সব

বাগানে এটা সমান হয় না) প্রদান করা হয়ে থাকে। ১৯৮০ র দশকে ২০/২৫ শতাংশ বোনাস ও পেয়েছেন শ্রমিকরা কিন্তু এই ঘটনা এখন ইতিহাস। দেশ জুড়ে যেরকম চিট ফাণ্ড এর প্রতারণা চলছে, চা শ্রমিকের provident fund এও সেরকম জমাকৃত ধনরাশি থেকে ও তাদের বঞ্চনার প্রতারণা চলছে। আমাদের এখানে বলে নিতে কোথাও বাধবে না যে, কিছু শাসক শ্রেণির সীমাহীন অবজ্ঞা ও অবহেলার দরুনই চা বাগানের শ্রমিকরা তাদের ন্যায্য অধিকার সুযোগ সুবিধে থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। বরাক উপত্যকার প্রধান শিল্প চা-এর শ্রমিকদের অর্থনৈতিক নিপীড়নের কাহিনি বলতে গেলে হয়তো রামায়ণ দাঁড়িয়ে যেতে পারে একটা। শ্রমিকদের সাথে কথা বললে, বাগান ঘুরে বেড়ালেই জানা যায় যে তাদের PF এর টাকা সময়মত জমা পড়ছে ঠিকই কিন্তু সময়মত তা পাচ্ছেন না ইত্যাদি। এর অনেক প্রামাণ্য এবং তথ্য হাতে এসে ঠেকে। বাগান মালিক বা পরিচালন কর্তৃপক্ষের গাফিলতির বিরুদ্ধে PF পেনশন টাকা সময়মতো জমা না পড়ার অভিযোগ অনেকের রয়েছে।

১৯৫১ সালে আইন অনুযায়ী শ্রমিকদের বিভিন্ন সুযোগ সুবিধে প্রধান করা হলেও বাস্তবে তা আমাদের রাজ্যের চা শ্রমিকদের থেকে বঞ্চিত। ১৯৫৫ তে আসাম চা বাগিচা ভবিষ্যনিধি প্রকল্প আইন এবং ১৯৬৭ 'পেনশন প্রকল্প' আইন প্রণয়ন করা হয়। এই প্রকল্প চা-শ্রমিকদের সামাজিক জীবনে কিছুটা সুন্দরতা নিশ্চিত করে, সৃষ্টি করে সুস্থ সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের। মুক্ত বাজারের ফলে বিশ্বের বাজারে চা যখন একটা লাভজনক ব্যবসা তখন একদল ট্রডার চা শিল্পে প্রবেশ করে যাদের একমাত্র লক্ষ্যই হল কৌশলে কম সুযোগ দিয়ে শ্রম পাওয়া। আর এই মূল উদ্দেশ্য পুরো করতে যে কোনো অন্যায় দুর্নীতি করতে

তাদের বিন্দুমাত্র দ্বিধা-দ্বন্দ্ব নেই । ফলে ‘চা’ এর অকশন রফতানি বাজার, অভ্যান্তরীন বাজার, শ্রমিক-কর্মচারীর সামাজিক নিরাপত্তা প্রকল্প সর্বত্র এদের থাবা বসায় ।

চা বাগান শুরুর সময় থেকেই অর্থনৈতিক নিপীড়ন চা বাগান গুলোতে ছিল, যা আজও বর্তমান । সেদিক দিয়ে খুব একটা পরিবর্তন হয়েছে বলে আমাদের মনে হয় না ।

চতুর্থ অধ্যায়

সমকালীন পণ্য সংস্কৃতি বনাম বরাকের চা বাগিচার জনগোষ্ঠী ও জনজীবন

সভ্যতার আদিকাল থেকেই সংস্কৃতির সূত্রপাত। বস্তুত বাঁচার প্রয়োজনে মানুষ যে ব্যবহারিক সংস্কৃতির বিকাশ ঘটিয়েছে তারই অনিবার্য অনুষঙ্গে প্রকাশ হয়েছে তার মানস-সম্পদ সঞ্জাত অভিব্যক্তিগুলি। 'সংস্কৃতি' শব্দটির তাৎপর্য নিয়ে ভাবলে দেখা যাবে 'সংস্কৃতি' শব্দের আড়ালে দুটি ব্যঞ্জনা রয়েছে স্বতঃস্ফূর্তভাবে তৈরি হওয়া কোনও প্রত্যয় বা ধারণা, যা অধিকাংশ সময়েই পরিবেশ, পরিবার, সমাজ প্রভৃতির প্রভাবে গড়ে ওঠে, এবং পরিবর্তনশীল, পরিমার্জনা, সুন্দরভাবে বিন্যাস করা ইত্যাদি। আরও একটি তাৎপর্য হল মানুষের সভ্যতার সামগ্রিক বিকাশের সঙ্গে তা বিজড়িত। নাচ, গান, অভিনয়, আবৃত্তি, কলা, ভাস্কর্য ইত্যাদি নানাবিধ কলাবিদ্যার মধ্যেই তার পরিচয় নিহিত থাকে।

বিশ্বায়ন তার ভাল-মন্দ সব নিয়েই এখন অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠেছে 'উদারীকৃত' অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে। মুক্ত অর্থনীতি এবং বিশ্বায়নের হেড কোয়ার্টার বলে যে দেশকে উল্লেখ করা হয়, সেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাংস্কৃতিক চালচিত্রটি একবার নিরীক্ষণ করলেই আরও একটি ভাল উদাহরণ মিলবে এই প্রেক্ষিতে। ফোকলোর-সংক্রান্ত যত থিওরিরই জন্মভূমি হোক না কেন মার্কিন দেশ, লোকসংস্কৃতির সেইসব প্রকরণগুলি সেই দেশ থেকে বিলুপ্ত হয়ে গেছে অনেক আগেই। পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলিতেও ধীরে ধীরে সেই

অবক্ষয়ের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে অনেকদিন হল। ভোগসর্বস্ব পণ্যব্যবস্থা, বাজার-অর্থনীতি ইত্যাদি ব্যপারগুলো সামাজিক ক্ষেত্রেও বিপুল অভিঘাত ফেলছে । এবং ভবিষ্যৎ এ আরও ফেলার আশঙ্কাও রয়েছে ।

পণ্য সংস্কৃতিতে অন্য কোথাও যাওয়ার দরকার নেই টিভি আর মোবাইল বড় ভূমিকা নিচ্ছে সব কিছু পাল্টে দিতে । বরাক উপত্যকার চা জনজাতিরা খুব সহজেই শুনতে পাচ্ছে 'ডিজে মিউজিক' । টিভিতে বিজ্ঞাপন দেখে নিচ্ছে কম্পিউটার এর মতোনই আরেকটা রয়েছে ছোট কম্পিউটার যাকে বলে 'ট্যাবলেট' । বার বার বিজ্ঞাপন দেখিয়ে তার মাথায় ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে যে খুব কম টাকায় সে এটা পেয়ে যেতে পারে, বিজ্ঞাপন দেখতে দেখতে সে বাধ্য হচ্ছে সেটা কিনে আনতে । সে এখন জানে, 'মেমোরি কার্ড' দিয়েই গান শোনা যায়, ফলে 'কার্ড রিডার' লাগিয়ে গান শুনছে আর কার্ড রিডারকে বলছে 'কাডিটার' । শিক্ষার অভাবের জন্যই ভালোভাবে ব্যবহার করতে পারছে না এটা বারবার নষ্ট হচ্ছে আর সে বারবার কিনে টাকা নষ্ট করছে । কোথাও নতুন জন্ম হয়েছে, বিয়ে লেগেছে তারা, 'সাউন্ড বক্স' বাজাচ্ছে । আগে যেখানে হয়তো তাদের প্রচলিত রীতি দিয়ে এটা তারা করতো, এখনও করছে কিন্তু প্রাধান্য বেশি পাচ্ছে সিনেমা জগতের গান ও ভাবনা । বলা নিষ্প্রয়োজন যে এগুলো সব একটা শ্রমিক করছে দৈনিক ৭৫ টাকা মজুরি পেয়েই । দিনরাত বাজারিকরণের গান শুনছে, ডিজে শুনছে, মশাপ শুনছে প্রভৃতি । ওগুলো শুনতে শুনতে সহজেই সে বুঝে নিতে পারছে যে আধুনিক যন্ত্রানুসঙ্গে নতুন স্বাদে শ্রোতাদের কাছে আসছে সুর যা এই প্রজন্ম বেশ ভালো ভাবেই গ্রহণ করছে । ফলে তারা ও বুদ্ধি করে তাদের গানে এখন অনেক সংমিশ্রণ ঘটাচ্ছে ।

আমাদের এই বিশ্বাস রেখেই এগিয়ে যেতে হবে যে, লোকসংস্কৃতির উত্তরাধিকার আমাদের ধমনীর ভেতরে রয়েছে জিনকোষের মতই; ফলে বিশ্বায়ন যতই আর্থসামাজিক মুমূর্ষূতা ঘটাক না কেন, শেষ পর্যন্ত ঐ লোকায়ত ঐতিহ্যই বাঁচিয়ে রাখবে মানুষকে পরবর্তী সূর্যোদয়ের জন্য।

পঞ্চম অধ্যায়

বরাকের চা জনজাতির লোকসাহিত্যে জনজীবন ও সংস্কৃতি

চা-জনজাতিদের ও একটা নিজস্ব সাহিত্য-সংস্কৃতি রয়েছে । ছড়া, প্রবাদ, ধাঁধা, ঘুমপাড়ানি গান এ সবকিছুর মধ্যে দিয়েই তারা তাদের হাসি-কান্না; দুঃখ-সুখ তুলে ধরে। ঔপনিবেশিক শাসকের কথা তাদের একটি প্রচলিত গানে দেখা যায়, -

সাহেব বলে কাম কাম
বাবু বলে ধরে আন
সর্দার বলে লব পিঠের চাম
ও দাদা ধনীরাম, কুদাল মারা
বড় কঠিন কাম ।

যে কোন সমাজের লোকসাহিত্যে সেই সমাজ তার সামগ্রিক রূপ নিয়েই প্রতিফলিত হয়ে থাকে। সেই সমাজের আচার-ব্যবহার, রীতি-রেওয়াজ, উৎসব-অনুষ্ঠান, জন্ম-মৃত্যু, প্রেম-ভালবাসা-যৌনতা, খাদ্য-পানীয়, বিধিনিষেধ ইত্যাদি স্ব কিছুই সগৌরবে স্থান লাভ করে থাকে । শুধু সমাজ ঘটিত প্রসঙ্গগুলোই বা বলা কেন, পারিপার্শ্বিক অরণ্য-প্রকৃতি, গাছপালা, জীবজন্তু, পাখি পাখালি, গ্রাম নাম সব কিছুই লোকসাহিত্যের বিষয়বস্তু হতে পারে । বলাবাহুল্য যে লোকসাহিত্যের আঞ্চলিক চরিত্রধর্ম এগুলোর মাধ্যমেই রক্ষিত হয়ে থাকে ।

কেউ কেউ বলেন, লোকসাহিত্য কোন সম্প্রাদায় বা গোষ্ঠীর অলিখিত সাহিত্য । অর্থাৎ লোকসাহিত্য কোনদিনই কাগজে-কলমে লিখিত হয় নি; মুখে-মুখেই এর প্রচার এবং প্রসার । অন্য কথায়, লোকসাহিত্য যেমন অলিখিত সাহিত্য, তেমনি মৌখিক সাহিত্য ও বটে । কিন্তু লিখিত হলেই লোকসাহিত্য তার লোক বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলে একথাও অনেকেই স্বীকার করেন না । কিন্তু আসল কথা হল লোকসাহিত্যের বড় ধর্মই হল সজীবতা, সচলতা । শুকনো কাগজের পাতায় যতোই মধুর করে ঝুমুরের পদাবলী লিপিবদ্ধ হোক না কেন, ঝুমুর নাচের শারীরিক আন্দোলন এবং নয়নভঙ্গি এবং রসাপ্লুত জনতার আনন্দোল্লাস পরিবেষণ করতে পারে না ।

শোষণ, বঞ্চনা, প্রতারণা, দারিদ্রতা এখনো বরাক উপত্যকার চা জনগোষ্ঠীর পিছু ছাড়েনি । শিক্ষা, চিকিৎসা আর পুষ্টির অভাবে সীমাহীন কষ্টের সাথে দিন কাটাচ্ছেন যারা তাদের ও রয়েছে একটা নিজস্ব ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি । এতো প্রতিকূলতার মাঝেও তারা হারিয়ে যেতে দেবেন না তাদের সংস্কৃতি ।

ষষ্ঠ অধ্যায়

বরাকের চা জনগোষ্ঠী এবং ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা ও ত্রিপুরা অঞ্চলের চা বাগানের জনসমাজ

চায়ের চাষ আসামের প্রধান শিল্প । শুধুমাত্র রাজ্যের নয় জেলার মানে বরাক উপত্যকার আর্থিক শ্রীবৃদ্ধিতে এর অবদান অনস্বীকার্য । চা শিল্পের জন্যই অন্যান্য অঞ্চলের সংগে এর যোগাযোগ ব্যবস্থা ভালো রয়েছে । 'বরাক উপত্যকা' আসামের দক্ষিণে অবস্থিত । এর আরেকটি নাম হচ্ছে 'পূর্ববঙ্গ' বা 'ঈশানবঙ্গ' বিভাজনের আগে এর নাম ছিল 'সুরমা- বরাক' । মূলত 'বরাকনদী' থেকেই 'বরাক উপত্যকা' নামটি এসেছে । এখানে অন্যান্য আর সব জনজাতির মধ্যে রয়েছে বাঁশির সুরে, মাদলের তালে ঝুমুর গানে মন মাতিয়ে তোলা চা জনজাতি সংস্কৃতি । ইংরাজি ১৮৫৬ সালে উইলিয়াম সন এণ্ড কোম্পানীর হাত ধরে শুরু হয় বরাক উপত্যকায় চা বাগান । প্রথম চা বাগান বরসাঙ্গন । এখানে শুরুর দিকে শ্রমিকরা নাগা, লুসাই, ডিমাসা প্রভৃতিরা থাকলেও পরে আড়কাঠি সহযোগে নানা প্রলোভন দেখিয়ে বরাক উপত্যকায় উত্তর প্রদেশ, বিহার, পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া, মেদেনিপুর, ছোটনাগপুর, পুরুলিয়া, বর্ধমান, ওড়িশা, মাদ্রাজ, ঝাড়খণ্ড ও অন্দ্রপ্রদেশ প্রভৃতি অঞ্চল থেকে দলে দলে পুরুষ মহিলা ও শিশুদের বরাক উপত্যকার চা বাগান গুলোতে আনা হয় । চুক্তির ভিত্তিতে তাঁদের কাজে নিয়োগ করা হয় একসময় কাজ করতে করতে চুক্তি শেষ হয়ে যায় কিন্তু তাদেরকে এখানেই থেকে যেতে হয়, হয়তো বাধ্য হয়েই তাদেরকে

থাকতে হয়েছে । পুঁজির লক্ষ্যই তো হচ্ছে আসলে সস্তায় শ্রম পাওয়া । এই ব্যাপার বরাক উপত্যকার সাথে ভিন্ন উপত্যকার চা বাগানের জনসমাজ নিয়ে আলোচনা করে দেখা যেতে পারে যে সব কটা বাগানের অবস্থান কি রকম । ব্রিটিশ উপনিবেশের হাত ধরেই মূলত চা বাগানের শুরু হয়, তাহলে স্বাধীনতার পরবর্তী সময় এসে দাঁড়িয়ে মানে উপনিবেশোত্তর পর্যায়ে এসে একটু তাকিয়ে দেখা যেতেই পারে মূলত অবস্থান কিরকম চা বাগান গুলোর কোথাও কিছু পাল্টাচ্ছে না চা শ্রমিকরা আসলে এখনো উত্তর উপনিবেশিক মুখোশধারি শাসক বর্গের হাতের খেলার পুতুল ।

'গাছ হিলালে পয়সা ঝড়ে' এই প্রলোভন দেখিয়ে চা শ্রমিকদের বরাক উপত্যকায় আনা হয় । এরপর চলতে থাকে তাঁদের উপর, ধারাবাহিক অত্যাচার, নির্যাতন । নির্যাতিত হতে হতে একসময় যখন তারা ঠিক করল দেশে পরিজনদের কাছে ফিরে যেতে হবে তখন তারা মূল্ক চলো আন্দোলনে যোগ দেয়, এর ফলস্বরূপ কি হয়েছে সেটা হয়তো ভেবে দেখার বিষয় । তবু ১৯২১ সালে এখানকার চা শ্রমিকরা বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠন সহযোগে মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনে ডাকে সারা দিয়ে বেরিয়ে পরে । উপত্যকার ইতিহাসে যা 'চরগোলা এক্সোডাস' নামে খ্যাত । চা বাগানের চা- গাছ বছরের পর বছর ধরে যত্ন করা, কুঁড়ি থেকে বড় করে তোলেন চা শ্রমিকরা । পাতা ছেঁড়া থেকে শুরু করে বিভিন্ন পর্যায়ে পরি- শোধন বা দেশে- বিদেশে পাঠানোর সিংহভাগ কৃতিত্বই চা শ্রমিকদের । অথচ সেই শোধনকৃত চা পানের কোনো আর্থিক সংগতি নেই চা শ্রমিকদের ।

বলা যেতে পারে ফাঁকির ফাঁদে পড়া এই সব জনজাতিরা যে জায়গারই হোক না কেন এদের অবস্থান আসলে একই। শোষণ, বঞ্চনা, প্রতারণা এই সব জনগোষ্ঠীর পিছু ছাড়ে নি । বরাক উপত্যকা, ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা, ত্রিপুরা অঞ্চলের চা জনজাতিদের অবস্থান প্রায় একই, স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে এসে দাঁড়িয়েও তারা শাসন এবং শোষণের কবল থেকে বেরিয়ে আসতে পারে নি । শুধু মুখোশ পাল্টায়, মুখ একই থেকে যায়। যেখানে আর্থ সামাজিক অবস্থানের কোনও পরিবর্তন হয় নি অথচ তারা দিনরাত লড়ে যাচ্ছে, নিজের সাথে, প্রকৃতির সাথে, ঔপনিবেশিক মুখোশধারি শাসকদের সাথে। এত অভাব অনটন এর মধ্যেও তারা বাঁচিয়ে রেখেছে তাদের সংস্কৃতি।

উপসংহার

চা জনজাতিদের জীবন ও সংস্কৃতির উপর বস্তুগত কারণেই চা শিল্পের প্রভাব পরিলক্ষিত হয় । একদিকে বাইরে থেকে নিয়ে আসা শ্রমিকদের নতুন জীবিকার মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয় । অন্যদিকে চা চাষের জন্য স্থানীয়দের জমি উৎখাত করে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে ঠেলে দেওয়া হয় । উপনিবেশোত্তর চেতনা সবার আগে মুখোশ থেকে আসল চেহারাকে এবং পানীয়কে বোতল থেকে চিনিয়ে দেওয়ার প্রক্রিয়াকে প্রাধান্য দেয় । চা জনজাতিরা আসলে বুঝতেই পারে না আসল শত্রু যে কারা । কেন পারে না তার কারণ হল শিক্ষা । আজও একুশ শতকে দাঁড়িয়ে চা বাগানগুলোতে শিক্ষার পরিবেশ খোঁজা বিড়ম্বনামাত্র ।

উপনিবেশোত্তর পর্বে এসে চাবাগানের জনজীবন কেন্দ্রিক আলোচনা করতে গিয়ে আমরা খুঁটিনাটি সব ব্যাপারগুলো বিশ্লেষণ করেছি ।যতটুকু আমরা আলোচনা করেছি তার শেষকথা বলে কিছু বলা মুশকিল তবু যে পর্যায়ে আমরা হাত দিয়েছিলাম, যে ভাবনা থেকে, যে বিন্দু থেকে আমরা সূচনা করেছিলাম সেখানে আর দাঁড়িয়ে নেই মনে হয়। তাদের লেখালেখি তাদের ভাবনা, তাদের জীবনপ্রণালী নিয়ে আরও ভাবনার প্রয়োজন আছে । তবে হাতের কাছে যে বিষয়গুলো উঠে এসেছে তাকে সামনে রেখে যেগুলো কথা আমাদের বলার তাই আমরা বলেছি এবং শেষে আমরা বলব যে অসম্ভব বলে কিছু নেই। উত্তরণ কোথাও সম্ভব বলে মনে হচ্ছে । উত্তর উপনিবশিক পর্বে বা স্বাধীনতার পরবর্তী পর্যায়ে এসে আমরা যে ব্যাপারগুলো দেখলাম সবগুলোই

নীতিগত ভাবে ঠিক আছে, শিক্ষা, চিকিৎসা, স্বাস্থ্য, সংস্কৃতি, অর্থনীতি ইত্যাদি সব বিষয়গুলোই ঠিক আছে কিন্তু যে অগ্রগতির কথা ছিল, সামনে এগোনোর যে প্রয়াস তা উপনিবেশিক কালে যা ছিল উত্তর উপনিবেশিক কালে এসেও খুব একটা পরিবর্তন কোথাও চোখে পড়ে না। কিছুটা হয়েছে তা অস্বীকার করা যায় না; কিন্তু আমূল পরিবর্তন যেটা হওয়া দরকার তা হয়নি। যে বৈচিত্র আনয়নের প্রয়াস লক্ষ্য করা গিয়েছিল তা সেরকমভাবে গড়ে ওঠেনি। তা হয়তো দীর্ঘ কয়েক দশক অব্যাহত থাকবে।আশায় বাঁধি ঘর শুভবুদ্ধির উদয় হবে। অরাও একদিন গেয়ে উঠবে গান উই শ্যাল অভারকাম। আমাদের ভাল লাগবে যারা উপত্যকার মধ্যে থেকেও একটা দ্বীপের মত বাস করছে, তারা বেরিয়ে আসবে একজাতি একপ্রান হয়ে।মানুষের অধিকারে মুখর হয়ে উঠবে।